ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454-1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-I, September, 2025, Page No. 225-230
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.01W.199

বাড়ি থেকে পালিয়ে: স্রষ্টার দ্বন্দ্ব, সৃষ্টির দ্বন্দ্ব

অগ্নিভ সান্যাল, *গবেষক, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 15.09.2025; Accepted: 22.09.2025; Available online: 30.09.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The relationship between literature and cinema is centuries-old. In the Bengali language too, many legendary directors have taken narratives from literature and adapted them into films. Ritwik Ghatak made the film 'Bari Theke Paliye' in 1959 based on the novel by Shibram Chakraborty. Shibram's novel was simple plot-driven narrative written for children. It also featured autobiographical elements and contemporary imagery. But when Ghatak made the film, it created a deeper resonance. In this film, Ritwik Ghatak, through the eyes of Kanchan, portrays the reality of post-partition Kolkata, while also using the multidimensional connotation of 'home' showing numerous homeless characters. This article attempts to explore the relationship between literature and cinema through an analysis of the works of Shibram and Ritwik.

Keywords: Film, Literature, Partition, Kolkata, Children Literature

চলচ্চিত্রের জন্ম বাইবেলের 'ওল্ড টেস্টামেন্ট'-এ বর্ণিত "And God said, 'Let there be light', and there was light" এর মতো কোনো আকস্মিক সংঘটন নয়। বরং ইতিহাসের সুদূর ছায়াময় গুহাতীত আলো-আঁধারি সময়ে ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী মানুষ যখন সরল যাদুবিশ্বাসে দেওয়ালে আঁচর কেটে জন্ম দিল সিং উঁচিয়ে তেড়ে আসা আপাত স্থির বাইসনের, তখনই বলা যায় জন্ম নিয়েছিল চলচ্চিত্রের আনুবীক্ষণিক ভ্রূণ। তারপর সেই গোপন ভ্রূণ ক্রমশ সময়ের ধূসর-সুড়ঙ্গ-লালিত অন্ধকারের পিচ্ছিল পথ বেয়ে ক্রমশ পরিপুষ্ট হতে হতে ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে লুমিয়ের ব্রাদার্সের হাত ধরে সমগ্র পৃথিবী শুনতে পায় নবজাতকের বিস্ময়ক্রন্দনধ্বনি। তারপর বহু যুগ কেটে গেছে। প্রতিভাবান চলচ্চিত্রকারদের হাতে চলচ্চিত্র ক্রমশ পা বাড়িয়েছে সাবালকত্বের পথে। অন্যান্য শিল্পমাধ্যম থেকে সে যেমন গ্রহণ করেছে রূপসজ্জার নব নব অলঙ্কার, তেমনি প্রতিদানে সমৃদ্ধ করেছে অন্যান্য শিল্পকে। সঙ্গীত, চিত্রকলা, নৃত্যকলার পাশাপাশি সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। চলচ্চিত্রের আদি ইতিহাসের দিকে তাকালে তাই লক্ষ্য করা যায় সাহিত্য নির্ভরতা এবং সাহিত্য নিরপেক্ষতা-উভয় প্রবণতাই। এ প্রসঙ্গে পূর্ণেন্দু পত্রী বলেছেন-

> "অন্বেষণ অথবা উন্মোচনের এই দ্বিমুখিতা থেকেই চলচ্চিত্র কখনও নিজেই সৃষ্টি করে নিয়েছে নিজের বিষয়, কখনও সাহিত্যের কাছে ছুটে এসেছে নির্মাণযোগ্য উপকরণের সন্ধানে।"[১]

বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসের ধারা লক্ষ্য করলেও আমরা দেখব সাহিত্যের হাত ধরেই চলচ্চিত্র খুঁজে নিয়েছে তার পায়ে চলা পথের সন্ধান এবং বহু ব্যবহৃত সেই পথেই শেষ পর্যন্ত তৈরী হয়েছে 'পথের পাঁচালী', সাহিত্য থেকে আখ্যান সংগ্রহ করে সত্যজিৎ রায় দেখিয়েছেন চলচ্চিত্রের অনন্যসাধারণ চলন। তারপরে সত্যজিৎ রায়ের 'অপরাজিত', 'জলসাঘর', 'চারুলতা', 'ঘরে বাইরে', ঋত্বিক ঘটকের 'অযান্ত্রিক', 'বাড়ি থেকে পালিয়ে', 'মেঘে ঢাকা তারা', 'তিতাস একটি নদীর নাম', মৃণাল সেনের 'ভুবন সোম', 'কলকাতা ৭১', 'খারিজ' প্রভৃতি চলচ্চিত্র বাংলা সাহিত্য

থেকে নিজস্ব আখ্যান গ্রহণ করে তাকে আপন শিল্পগুণের সমন্বয়ে পৌঁছে দিয়েছে এক অনন্য উৎকর্ষে। বর্তমান প্রবন্ধে ঋত্বিক ঘটকের 'বাড়ি থেকে পালিয়ে' চলচ্চিত্রটিকে শিবরাম চক্রবর্তীর লেখা উপন্যাসের সাপেক্ষে আলোচনা করব।

স্রষ্টার দ্বন্দ্ব: শিবরাম বনাম ঋত্বিক:

বাংলা সরস সাহিত্যধারায় এক স্বতন্ত্র অধ্যায়ের নাম- শিবরাম চক্রবর্তী। এই হাস্যরসসম্রাটের অন্তর্দর্শন এবং জীবনবোধ পাঠকের মনে বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। প্রথম দিকে বড়দের সিরিয়াস কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ ইত্যাদি রচনা করলেও বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধ হাস্যরসের ধারায় তাঁর আত্মপ্রকাশ বিশ শতকের বিশের দশক থেকে। গ্রিক দার্শনিক ও সাহিত্যতাত্ত্বিক অ্যারিস্টটলের কমেডি ভাবনায় জীবন ও আচরণের হাস্যকর অসংগতি এবং নিম্নশ্রেণীর চরিত্রের অনুকরণের প্রসঙ্গ রয়েছে। শিবরাম যেমন একদিক থেকে তাঁর রচনায় মানুষের জীবনের নানান অসঙ্গতি থেকে উদ্ভূত হাস্যরসের অবতারণা করেন, তেমনি সামাজিক বা রাজনৈতিক অসঙ্গতি ব্যঙ্গের ছলে চিহ্নিত করে দেন। তিনি লিখেছেন-

> "নিজের জীবন নিয়েই আমার যত গল্প লেখা, বুঝলেন কিনা, আমার জীবনটা অনেকটা গল্পের মতই। জীবন দেখে, জীবন থেকেই তো সাহিত্য ছেকে নিতে হয়। আমার জীবনে আমার নিজের জীবনটাই ঘুরে ফিরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেছি কেবল, সীমিত ক্ষমতা নিয়ে তার বাইরে আর যেতে পারিনি, তাই ঘুরে ফিরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই জীবনটাকেই দেখিয়েছি আমার রচনায়।"[২]

মানুষের নানান দুর্বলতা আর অসঙ্গতিকে তিনি জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবেই দেখেছেন। শিশুর সারল্য নিয়ে মানবজীবনের বিচিত্র কান্ডকারখানা তিনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন তাঁর লেখায়। তাই তাঁর লেখায় উঠে এসেছে স্পষ্টবাদিতা ও সামাজিক মূল্যবোধের প্রতিচ্ছবি।

> "সময়ের ছাই সরে গেলে দেখা যায় ইতিহাসে দাঁড়িয়ে আছেন এক অগ্নিপুরুষ: তাঁর নাম ঋত্বিককুমার ঘটক।"[৩]

ঋত্বিক ঘটক শুদ্ধতম বাঙালি পরিচালক, যাঁর মজ্জায় মিশে ছিল ভাঙা বাংলার পাঁজরফাটা দীর্ঘশ্বাসের করুণ রাগিণী। হলিউডি কেতাদুরস্ত কৃত্রিম সাংস্কৃতিক প্রতিগ্রহণের যুগে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে তিনি ধারণ করেছিলেন নিজের জীবন ও চলচ্চিত্রকর্মে। আর শুধুমাত্র সেই অপরাধেই তাঁকে হতে হয়েছিল নীলকণ্ঠ। সমাজ নিজের হাতে যত্ন করে তাঁর গলায় ঢেলে দিয়েছিল আপাত ব্যর্থতার বিষমদ।

শুধুমাত্র সমসময়ের যুগযন্ত্রণার নিদারুণ প্রতিচ্ছবিই নয়, যৌথ অবচেতনা (Collective unconscious) থেকে উৎসারিত পুরাণপ্রতিমা নির্মাণে ঋত্বিকের চলচ্চিত্র ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের দখিন খোলা জানলা। একদিকে মার্ক্সীয় দ্বন্দ্ব, শ্রেণীচৈতন্য, রাজনৈতিক দর্শন যেমন ফুটিয়ে তোলে সভ্যতার সংকট, অন্যদিকে উপনিষদের প্রভাবে এবং রাবীন্দ্রিক মঙ্গলচিন্তায় ঋত্বিকের চলচ্চিত্রে শাশ্বত মানবের জয়ধ্বনি শোনা যায়। সে কারণেই তিনি বলেছেন-

> "'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ', রবিবাবুর এই কথাটা আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি।"[৪]

সৃষ্টির দ্বন্দ্ব: উপন্যাস বনাম চলচ্চিত্র:

'বাড়ী থেকে পালিয়ে' প্রকাশিত হয় ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে। এই উপন্যাসটি এক অর্থে শিবরাম চক্রবর্তীর আত্মজৈবনিক স্মৃতির পুনর্নির্মাণ। তাঁর 'ঈশ্বর পৃথিবী ভালোবাসা' এবং 'ভালোবাসা পৃথিবী ঈশ্বর' বইদুটিতে ছড়িয়ে থাকা ঘটনাবলীর সঙ্গে তাই 'বাড়ী থেকে পালিয়ে' উপন্যাসের অনেক ঘটনার হুবহু সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। শিবরামের জীবন ঘটনার বিন্যাসে হাসি মশকরায় টইটম্বুর। জন্মস্থান চাঁচল থেকে কলকাতায় পালিয়ে আসার ঘটনা অথবা দুর্ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা স্মৃতি থেকে তিনি লিখেছিলেন 'বাড়ী থেকে পালিয়ে' উপন্যাসটি। উপন্যাসটির প্লট শিশুসাহিত্যের উপযোগী সরল। কাহিনীর প্রধান চরিত্র কাঞ্চন বাবার শাসনের ভয়ে বাড়ি থেকে পালায় এবং কলকাতায় গিয়ে পৌঁছায়। বিরাট 'মহানগর'-এ নানান ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে কাঞ্চনের চোখ দিয়ে লেখক কলকাতার সময়নিষ্ঠ সংগতি ও অসংগতিতে ভরা দৃশ্যপট অঙ্কন করেন। শেষ পর্যন্ত নানান আকস্মিকতায় ভর করে এক আশ্চর্য, প্রায় অবিশ্বাস্য সমাপতনে কাহিনী পৌঁছায় এবং কপর্দকহীন অবস্থায় বাড়ি থেকে পালানো কাঞ্চন বিপুল অর্থ ও সম্পদ নিয়ে বাড়িতে ফিরে আসে।

আপাতভাবে কাহিনীটিকে একমাত্রিক মনে হলেও ঘটনার আড়ালে অসংগতি, কৌতুক এবং সময়চিত্র উপন্যাসটিকে অনন্য মাত্রা দান করেছে। উপন্যাসের একদম শুরুতে বাড়ির ঠাকুরের পূজার ভোগ চুরি করে খাওয়ার মধ্য দিয়ে কাঞ্চনের কৈশোরের চপলতা শুধু নয়, সেইসঙ্গে পারিবারিক প্রতিষ্ঠানবিরোধিতারও ছবি ফুটে উঠেছে। বাড়ির পুরুতের ছেলে বিনোদের পৈতে ছিঁড়ে যাওয়া, অভিশাপ দেওয়া এবং কাঞ্চনের প্রতিশোধ নেওয়ার অংশে ফুটে ওঠা ব্রাহ্মণতন্ত্রের প্রতি কৌতুক হাস্যরসের অবতারণা করেছে। উপন্যাসের শুরুতেই আমরা দেখতে পাই কাঞ্চনের বাবা খুব কড়া শাসনে তাকে বেঁধে রাখতে চান, যদিও মা তার প্রতি অনেক সংবেদনশীল। কিন্তু এতদসত্ত্বেও শাস্তির ভয়ে হঠাৎ কাঞ্চনের বাড়ি থেকে পালানোর ঘটনা অত্যন্ত আকস্মিক এবং দুর্বল। বাড়ি থেকে কলকাতায় পালিয়ে যাওয়ার অংশে কাহিনীতে উপস্থিত হওয়া চরিত্রগুলির কাঞ্চনের প্রতি সহানুভূতি ও ঔদার্য অতিরিক্ত এবং অবিশ্বাস্য বলেই মনে হয়েছে।

কলকাতায় পৌঁছানোর পর গ্রাম্য কিশোরের মহানগর-অভিজ্ঞতা উপন্যাসের প্রধান অংশ। কাঞ্চনের চোখ দিয়ে একদিক থেকে যেমন শিবরাম গ্রাম-শহরের দ্বন্দ্বকে ফুটিয়ে তুলেছেন- গাড়ি, ফেরিওলা প্রভৃতি অংশে, তেমনি কাঞ্চনের মধ্যে তিনি আরোপ করেছেন বয়সাতিরিক্ত পরিণতমনস্কতা। বিয়েবাড়ির অংশে একদিক থেকে কৈশোরের অস্ফূট প্রেমানুভূতি যেমন প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি গ্রাম্য কিশোর ও নাগরিক বালিকার শিক্ষার পার্থক্যও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এখানে চমৎকারভাবে শিবরাম হাস্যরসের আবহকে নির্মাণ করেছেন। যদিও তার পরেই বিয়েবাড়ির ডাস্টবিনে খাবার নিয়ে ভিখারী ও কুকুরদের কাড়াকাড়ি একদিক থেকে যেমন মহানগরের আর্থিক বৈষম্যের কথা সূচিত করে, তেমনি অন্যদিকে এই দৃশ্যের প্রতিক্রিয়ায় কাঞ্চনের সরল সহানুভূতিশীল চিন্তাও ফুটে ওঠে-

> "শেষে এই স্থির করল, সে বড় হলে কলকাতার সমস্ত ভিখারীদের একটা বড়ো রকমের ভোজ দেবে।"[৫]

'বাড়ী থেকে পালিয়ে' উপন্যাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো একটি বিশেষ সময়ের উপস্থাপন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের যে উল্লেখযোগ্য কালপর্ব এই উপন্যাসে বিধৃত রয়েছে, তা হল অসহযোগ আন্দোলনের সূচনাংশ। কাঞ্চন একটি খবরের কাগজে দেখেছিল লেখা আছে- "মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন - ১৯২১ সনের মধ্যেই স্বরাজ দিব।"[৬] 'India's Struggle for Independence' গ্রন্থ থেকে আমরা জানতে পারি ১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে-

> "Gandhiji promised that if the programme was fully implemented, Swaraj would be ushered in within a year."[৭]

এছাড়াও চিত্তরঞ্জন দাশের ভলান্টিয়ার্সদের প্রসঙ্গ, তাদের গ্রেপ্তার, স্কুল-কলেজ বয়কট, চিত্তরঞ্জন দাশের দেশের জন্য সর্বস্ব সমর্পণের কথাও এই উপন্যাসে নানা ঘটনাপ্রসঙ্গে এসেছে। 'স্বরাজ' সম্পর্কে কাঞ্চনের জিজ্ঞাসা-

> "আচ্ছা, গরীব মানুষদেরও স্বরাজ হবে তো? স্বরাজ হ'লে তারা ভালো খেতে পাবে, পরতে পাবে?"[৮]

তার সংবেদনশীল মনের পরিচয় দেয়।

এই উপন্যাসে বারবার কাঞ্চনের বাবা এবং মায়ের প্রসঙ্গ এসেছে। বাবার চাণক্যবাদী শাসনে শুধু কাঞ্চন নয়, কাঞ্চনের মনে হয়েছে তার মা-ও জর্জরিত। তাই একটি অংশে কাঞ্চন তার বাড়ি থেকে পালানোর কারণ হিসেবে মায়ের দুঃখ ঘোচানোর সংকল্পে রোজগারের চেষ্টার কথা জানায় এবং শৌখিন বিলাসদ্রব্যের ফেরিওলার সাক্ষাতে সেই ইচ্ছা আবার চাগাড় দিয়ে ওঠে।

উপন্যাসের একদম শেষে কাঞ্চন এক অপরিচিত ধনী ভদ্রলোককে তার রেসের মাঠে পয়সা জেতায় সহযোগিতা করে প্রভূত অর্থের মালিক হয়ে যায় এবং নানান শৌখিন দ্রব্য সংগ্রহ করে বাড়ি ফিরে যায়। এখানে প্রচুর অর্থ সত্ত্বেও খদ্দরের বস্ত্র পরা এবং গরীবদের খাওয়ানোর জন্য বড়ো অঙ্কের অর্থ দিয়ে আসার মধ্যে কাঞ্চনের অনুভূতিশীল মনের পরিচয় পাওয়া গেলেও উপন্যাসের শেষ অংশের এই আকস্মিক সমাপতন কাহিনীর দুর্বলতম অংশ। বাড়ি ফিরে কাঞ্চনের সঙ্গে মায়ের কথোপকথনকেও অনেকাংশে আরোপিত বলে মনে হয়েছে।

১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে মুক্তি পায় ঋত্বিক ঘটকের 'বাড়ি থেকে পালিয়ে' চলচ্চিত্রটি। ঋত্বিক সাহিত্য থেকে চলচ্চিত্রের আখ্যান গ্রহণের প্রসঙ্গে বলেছেন-

"...কোনো সাহিত্যকর্মের ভেতরে সম্পূর্ণ অনুপ্রবিষ্ট হয়ে গিয়ে তাকে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে ধ্যান করে আমার মনের মধ্যে যে আবেগ এবং যে প্রকাশবাঞ্ছা সতত সঞ্চারমান হতে থাকত- তাকে আমার চিত্রকর্মে প্রকাশ দিতে গিয়ে সেটা আমার নিজস্ব শিল্পকর্ম হয়ে উঠত।"[৯]

চলচ্চিত্রের শুরুতেই মা এবং বাবার সঙ্গে কাঞ্চনের সম্পর্ক খুবই নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছে। এলডোরাডোর বই পড়া এবং অনেক দূরে চলে যাওয়ার প্রসঙ্গ চলচ্চিত্রের শুরুতেই কাঞ্চনের কল্পনায় লালন করা নিরুদ্দেশ যাত্রার বীজটিকে চিহ্নিত করে দেয়। 'কাজলদীঘি হাইস্কুলের হেডমাস্টার' কাঞ্চনের বাবার পুরুষতান্ত্রিক শাসন এবং আধুনিক শহুরে জীবনযাত্রার প্রতি কঠোর মনোভাব চলচ্চিত্রে চমৎকারভাবে রূপায়িত। কাঞ্চনের মা-ও স্নেহ-ভালোবাসা-করুণার প্রতিমূর্তিরূপে প্রকাশিত হয়েছেন। সেইসঙ্গে বাড়ির চাকর যে কিনা শিবরামের উপন্যাসে ছিল নামগোত্রহীন, সেই 'নন্দ'কে ঋত্বিক কাঞ্চনদের বাড়ির একজন সদস্য হিসেবেই নির্মিত করেছেন। উপন্যাসের উদ্ধত, বয়সাতিরিক্ত পরিণতমনস্ক কাঞ্চন চলচ্চিত্রে কল্পনাপ্রবণ কিশোর। তাই বাংলার নদী তার কাছে পরিণত হয় দক্ষিণ আমেরিকার ওরিনাকো নদীতে, যে নদীর তীরে লুকিয়ে আছে আদিম অধিবাসীগণ। এই অংশে কাঞ্চন ঋত্বিকেরই শিশুসত্ত্বায় রূপান্তরিত হয়েছে। শৈশবে পদ্মার চরে ঋত্বিকের ভাইবোনদের সঙ্গে খেলতে যাওয়া, তাদের আদিম অধিবাসীদের গল্প শোনানোর মধুর কাহিনীর কথা জানা যায় সংহিতা ঘটকের 'ঋত্বিক এক নদীর নাম' বইটি থেকে।

বাবার শাস্তির ভয়ে কাঞ্চন বাড়ি থেকে পালায় এবং ট্রেনে চেপে সরাসরি কলকাতা শহরে এসে উপস্থিত হয়। মহানগরে নিষ্পাপ কিশোরের অনির্দেশ্য অভিযাত্রার সূচনায় হাওড়া ব্রিজের লৌহশরীরের আড়ালে গান গাওয়া পাখিটির ছবি অসাধারণ ব্যঞ্জনাবহ। কলকাতার গগনচুম্বী অট্টালিকার বিস্ময়দর্শন করতে দিয়ে অতর্কিতে গাড়ি চাপা পরা থেকে কাঞ্চনকে বাঁচায় হরিদাস। প্রিন্সেপ ঘাটের পাশে এই দৃশ্যে পত্রহীন একটি গাছের ছবি আমরা দেখতে পাই, যে গাছটি চলচ্চিত্রের শেষাংশে ভিন্নতর ব্যঞ্জনা নিয়ে এসে উপস্থিত হয়। হরিদাসের 'বুলবুলভাজা' গানটির দৃশ্যের মধ্য দিয়ে মহানগরের অন্তরে লুকিয়ে থাকা সরল শিশুতীর্থের ছবি ফুটে উঠেছে। এছাড়াও হরিদাসের সংলাপে দেশভাগ এবং মৃত মায়ের প্রসঙ্গ এসেছে। 'তারপর আমি তাকে দেখেছি কত পাড়ায়, কত গলিতে' -তাঁর এই সংলাপে মাতৃভাবনার বিশেষ থেকে নির্বিশেষে বিবর্তনের ব্যঞ্জনা ফুটে উঠেছে।

চলচ্চিত্রে রেস্টুরেন্টের দৃশ্যটিও বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত কৌতুকময় কার্টুনচরিত্রের মতো হাস্যকর প্রৌঢ়ের খাওয়ার দৃশ্য কৌতুকের সৃষ্টি করে। অন্যদিকে জনৈক আড্ডাবাজ যুবক যখন বলে- "কলকাতা মৃতনগরী", তখন আগের হাস্যকর দৃশ্যটি ম্লান হয়ে সমসময়ের দুর্দশা-বিক্ষোভ ফুটে ওঠে। অপর একজন যুবকের বহুদিন আগে বাড়ি থেকে পালানো এবং সেই সময়ের ছন্দময়-যাদুভরা কলকাতা শহরের কথা শিবরামের উপন্যাসের অন্তর্বয়নরূপে ব্যবহৃত। উপন্যাসে কপর্দকশূন্য কাঞ্চনের প্রতি জনৈক ভদ্রলোকের সহানুভূতির হাত এগিয়ে আসে, কিন্তু চলচ্চিত্রে সরল বিশ্বাসে বিনা পয়সায় খাওয়ার অপরাধে কাঞ্চনের জোটে কানমলা ও ঘাড়ধাক্কা।

চলচ্চিত্রে একটি দীর্ঘ গানের দৃশ্য রয়েছে। পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণে একজন বাউলের সেই গানের কথায় ফুটে উঠেছে সমসময়ের যুগসংকট এবং কলকাতার বাস্তবনিষ্ঠ সমাজচিত্র –

"(ওই) পদ্মাপারের চরে আমার ছিল রে ঘরবাড়ি
আর ছিল মা জননী বিঘা দু খেতি বাড়ি
(আমি) কী দোষে হারালাম মাগো আইলাম সবই ছাড়ি
(এখন) যেইখানে হক কথা কই মা পিঠে পরে জুতা
(আমি) অনেক ঘুরিয়া শ্যাষে আইলাম রে কলকাতা।"

কাঞ্চনের চোখ দিয়ে ঋত্বিক দেখিয়েছেন বাস্তুহারাদের অস্থায়ী তাঁবুর সারি, ধূসর কারখানা, মৃত্যুর প্রতীক্ষারত শকুন, ব্যস্ত যানবাহন, গগনচুম্বী অট্টালিকা, ম্যানহোলে নোংরা পরিষ্কার করা শিশু, বাস্তুহারা সংগঠনের মিছিল এবং শ্রেণীবিভক্ত মানুষের সম্মিলিত বিচিত্র চিত্রমালা। ঋত্বিকের কাঞ্চন নিষ্ক্রিয়ভাবে পথে হাঁটে না, সেও মিছিলের একজন হয়ে কিশোরসুলভ ঔৎসুক্যে 'ইনকিলাব'এর পরেই বলে ওঠে 'জিন্দাবাদ'।

বিয়েবাড়ির দৃশ্য উপন্যাস থেকেই সম্পূর্ণ গৃহীত। কিন্তু তারপরেই ভিখারি ও কুকুরের ডাস্টবিনের খাবার নিয়ে কাড়াকাড়ির দৃশ্যে ভিখারির সংলাপে দুর্ভিক্ষের কথা বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকের কথা মনে করিয়ে দেয়।

চলচ্চিত্রে একজন সন্তানহারা মায়ের প্রসঙ্গ আসে, যিনি কলকাতার অলিতে গলিতে কিশোর ছেলেদের মধ্যে নিজের নিরুদ্দিষ্ট ছেলেকে খুঁজে বেড়ান। এই মহিলাটির মধ্যে স্নেহশীলা সম্পূর্ণ মাতৃমূর্তি ফুটে উঠেছে। পরবর্তীতে একটি অংশে তাই দেখা যায় জনতা কর্তৃক ছেলেধরা সন্দেহে প্রহৃত রক্তাক্ত প্রৌঢ়াটিকে দেখে ভিড়ের মধ্য থেকে কাঞ্চন 'ওটা আমার মা' বলে ডেকে ওঠে। তার এই স্বতঃস্ফূর্ত আকুতিতে সমীকৃত হয়ে যায় চলচ্চিত্রের বিভিন্ন অংশে ঘুরেফিরে আসা নির্বিশেষ মাতৃচেতনা।

ঋত্বিক চলচ্চিত্রে রাতের কলকাতার বৈভবময় চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। যে কলকাতায় রাতে বিজ্ঞাপনের আলো ঝলমল করে, সেখানেই আবার চোর এসে ফুটপাতে ঘুমের সুযোগ নিয়ে কাঞ্চনের জুতো নিয়ে পালায়।

চলচ্চিত্রে অন্যতম সংযোজন মিনি এবং তার বাবা-মায়ের প্রসঙ্গ। মিনির মায়ের সঙ্গে কাঞ্চনের আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে যদিও রোজগারের নেশায় কাঞ্চন অজান্তেই তার অসুস্থ 'মাসি'র মৃত্যুর পরোক্ষ কারণ হয়ে দাঁড়ায়। শুরুতে এক ঝলক দেখানো সেই পত্রহীন গাছটির নীচেই ঘটনাটি সংঘটিত হয়, কাঞ্চনের অভিযাত্রার শুরু এবং শেষের বিন্দুটি এক হয়ে যায়।

শেষাংশে হরিদাস প্রকাশিত হয় নির্দয় মহানগরের অন্তরে লুকিয়ে থাকা কোমল সত্তারূপে। কাঞ্চন বাড়ি ফেরে। তবে বিপুল অর্থ নিয়ে আপাত জয়ীর মতো নয়; তার 'রোজগার' হরিদাসের দাড়ি-ঝোলা এবং অপরিসীম অভিজ্ঞতা। কলকাতায় সে দেখেছে জীবন সংগ্রামের ভিন্ন ভিন্ন রূপ, প্রত্যক্ষ করেছে অপরাধজগতের খণ্ডচিত্র, সেইসঙ্গে সে পেয়েছে সহানুভূতিশীল হরিদাস, মা, মিনি, মাসি, ট্রামের অজ্ঞাত পরিচয় কন্ডাক্টর এবং সেই কুলিটিকেও যে তাকে মহানগরের স্বরূপ চিনিয়েছিল। দুরন্ত কল্পনাপ্রবণ কিশোর কাঞ্চন তাই বাড়ি ফেরে পরিণতবয়স্কের সাজসজ্জা নিয়ে। গ্রামবাংলার নৈসর্গিক দৃশ্যপট চলচ্চিত্রের শেষাংশটিকে বড়ো মায়াময় করে তুলেছে। 'চাণক্য আওড়ানো রাগী শাসনকর্তা' থেকে 'স্নেহময় কৌতূহলী' বাবাকে তাই সে বলে- "বাড়িই সবচেয়ে ভালো বাবা।"

কাঞ্চন স্বেচ্ছায় বাড়ি থেকে পালিয়ে ফের বাড়িতে ফিরতে পারে। কিন্তু সব 'বাস্তুহারা' কি ফিরে পায় তার ভালোবাসার আশ্রয়ভূমিটিকে? আমরা 'বাড়ি থেকে পালিয়ে' চলচ্চিত্রে দেখি কাঞ্চন একাই 'বাড়ি' থেকে চ্যুত নয়। হরিদাস, বাউল, উদ্বাস্তু মানুষের দল, ডাস্টবিনের খাবার খাওয়া ভিখারি, বোবার ভান করে ছবি আঁকা ছেলেটি, মিনির মা, গগনচ্যুত চিল – অসংখ্য 'বাস্তুহারা' চরিত্রের সমন্বয়ে চলচ্চিত্রটি এক গভীরতম ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। ঋত্বিক তাঁর 'সুবর্ণরেখা প্রসঙ্গে' পরবন্ধটিতে লিখেছিলেন-

> "... 'উদ্বাস্তু' বা 'বাস্তুহারা' বলতে এ-ছবিতে কেবল পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারাদেরই বোঝাচ্ছে না-... আমাদের দিনে আমরা সকলেই জীবনের মূল হারিয়ে বাস্তুহারা হয়ে আছি – এটাও আমার বক্তব্য। 'বাস্তুহারা' কথাটিকে এইভাবে বিশেষ ভৌগোলিক স্তর থেকে সামান্য স্তরে উন্নীত করাই আমার অন্বিষ্ট।"[১০]

আমাদের মনে রাখতে হবে এই চলচ্চিত্রে 'বাড়ি' কেবলমাত্র ইট-কাঠ-পাথরের স্থাবর আবাসভূমি নয়। অরিন্দম চক্রবর্তী তাঁর 'এ তনু ভরিয়া: দর্শন আপাদমস্তক' গ্রন্থে বাড়ি তথা ঘরের এগারোটি লক্ষণের কথা উল্লেখ করেছেন, যেগুলির মধ্যে অন্যতম হলো-

> "অতীতের সঙ্গে পূর্বপুরুষের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখার ঐতিহ্যের সুতো ধরে রাখার জায়গা।"[১১]

'নাগরিক'-এ নায়কের নদীর ধারে সুন্দর বাড়ির স্বপ্ন, 'অযান্ত্রিক'-এ মানুষের একান্ত ভালোবাসার আশ্রয়ভূমির ধ্বংস, 'মেঘে ঢাকা তারা'-য় উদ্বাস্তু কলোনির ছবি, 'কোমল গান্ধার'-এ স্থানিক এবং সাংস্কৃতিক আশ্রয়চ্যুতির ক্ষত, 'সুবর্ণরেখা'-য় ছোট্ট বিনুর সংলাপে ধ্রুবপদের মতো ফিরে আসা 'নতুন বাড়ি'র কথা, 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এ নদীকেন্দ্রিক একটি জাতির অস্তিত্বের সঙ্কট এবং 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো'-তে ঘর ছেড়ে অন্তহীন অনির্দেশ যাত্রা- ঋত্বিকের সমস্ত চলচ্চিত্রেই ঘুরেফিরে এই 'বাড়ি'র প্রসঙ্গ এসেছে। আসলে ঋত্বিক গোটা জীবন ধরে ছিন্নমূল চেতনায় হারানো সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের অনুসন্ধান করে গেছেন। তাই তাঁর চলচ্চিত্রে সময় এত করুণ, এত বিষণ্ণ, এত নির্মম!

অ-শেষ কথা:

শিবরাম তাঁর শিশুসুলভ মন নিয়ে কাঞ্চনের অভিযাত্রাকে চিহ্নিত করেছিলেন নানা অসংগতি থেকে উদ্ভূত কৌতুক ও হাস্যরসের আবহে এবং তাঁর শিশুদের জন্য লেখা এই উপন্যাসে অপরাধজগতের কোনো আঁধার আখ্যানকে তিনি নির্মিত করতে চাননি। তাই কাঞ্চনের কাছে কলকাতার কয়েকটি কঠোর বাস্তবচিত্র উন্মোচিত হয়ে পড়লেও সেগুলো পরিহাসনীয় উপেক্ষা বা সরল আপাত সমাধানে দূরীভূত হয়েছে। একারণেই শেষ অবধি মহানগরে অনাহূত কিশোর কাঞ্চনের ক্ষুধা-আশ্রয়হীনতার সাময়িক যন্ত্রণা থেকে ভাগ্যের সহায়তায় মুক্তি 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' রূপেই চিহ্নিত হয়। কিন্তু ঋত্বিক ঘটক সময়ের কালকূট পান করে হয়েছিলেন নীলকণ্ঠ। তাঁর রোগা পিঠে দগদগে হয়ে ফুটে ছিল কাঁটাতারের সুগভীর ক্ষত। সময়, মানুষ এবং পৃথিবীকে তিনি শিবরামীয় কৌতুকে নয়, বরং প্রত্যক্ষ করেছিলেন বাস্তবের কঠোরতা এবং অকৃত্রিম সংবেদনশীলতার মিশ্রণে। তাই হাস্যরসকে ছাপিয়ে এই চলচ্চিত্রে এক বিষণ্ণ সুর স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অস্কার ওয়াইল্ডের লেখা 'সুখী রাজপুত্রের গল্প'-এর প্রসঙ্গ হরিদাসের সংলাপে বসিয়ে তিনি গল্পের 'নীল নদের পাখিটি'র প্রত্যক্ষ করা দুঃখ-কষ্টের ছবিকে চলচ্চিত্রের সঙ্গে সমীকৃত করে তুলেছেন। সাহিত্য এবং চলচ্চিত্রের আঙ্গিকগত পার্থক্য অনেক, কিন্তু ভাবগত দিক দিয়ে উভয়েই আখ্যানধর্মী শিল্প। আখ্যানগত দিক দিয়ে, শিবরাম চক্রবর্তীর 'বাড়ী থেকে পালিয়ে' উপন্যাস শিশুসাহিত্য উপযোগী সার্থকতা লাভ করলেও, ঋত্বিক ঘটকের 'বাড়ি থেকে পালিয়ে' চলচ্চিত্র উপন্যাসটিকে অতিক্রম করে এক বিশেষ শিল্পগুণ লাভ করেছে, যা একে দান করেছে নির্বিশেষ সর্বকালীন এবং সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা।

তথ্যসূত্র:

১। পত্রী, পূর্ণেন্দু। সিনেমা সংক্রান্ত। দে'জ পাবলিশিং, সেপ্টেম্বর ২০১৬, কলকাতা, পৃ. ১০।
২। চক্রবর্তী, শিবরাম। ঈশ্বর, পৃথিবী, ভালোবাসা। বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস, অগ্রহায়ণ ১৩৬৭, কলকাতা, পৃ. ১০।
৩। ঘটক, ঋত্বিক। চলচ্চিত্র, মানুষ এবং আরো কিছু। দে'জ পাবলিশিং, জুলাই ২০১৮, কলকাতা, ভূমিকা।
৪। তদেব, পৃ. ৮৯।
৫। চক্রবর্তী, শিবরাম। বাড়ি থেকে পালিয়ে। দি বুক এম্পরিয়ম লিমিটেড, শ্রাবণ ১৩৫৩, কলকাতা, পৃ. ৪০।
৬। তদেব, পৃ. ৪৫।
৭। Chandra, Bipan edited. India's Struggle for Independence. Penguin Books, 1989, Page no– 186.
৮। চক্রবর্তী, শিবরাম। বাড়ি থেকে পালিয়ে। দি বুক এম্পরিয়ম লিমিটেড, শ্রাবণ ১৩৫৩, কলকাতা, পৃ. ৪৬।
৯। ঘটক, ঋত্বিক। চলচ্চিত্র, মানুষ এবং আরো কিছু। দে'জ পাবলিশিং, জুলাই ২০১৮, পৃ. ৮৬।
১০। তদেব, পৃ. ১৫৩।
১১। চক্রবর্তী, অরিন্দম। এ তনু ভরিয়া: দর্শন আপাদমস্তক। অনুস্টুপ, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০২০, পৃ. ১৭৫।